শীলা

কলঙ্কিনী নদী

কলঙ্কিনী নদী

শীলার মামা একটু পাগল কিসিমের মানুষ। দুনিয়াতে অনেক কিসিমের পাগল আছে। শীলার মামা এম হক, কোন শ্রেণীতে পরে কে জানে? কয়েকটা উদাহরণ দিলে, পাঠক পাঠিকারা হয়তো একটা শ্রেণীতে ফেলে দিতে পারবেন। শীলার মামা এম হক, যে কোন চায়ের আড্ডা থেকে শুরু করে, সভ্রান্ত বিয়ের অনুষ্ঠানেও, অপরিচিতজনদের কাছে বলতে থাকে, চমৎকার পরীর মতো একটি মেয়ে আমাকে ভালোবাসতো। আমি বিয়ে করিনি। সে আরো বলে, বি সি এস প্রশাসন ক্যাডারে আমার চাকুরী হয়েছিলো, আমি করিনি। বাংলাদেশে, এই ধরনের কথাবার্তাকে সাধারণতঃ গপ বলা হয়ে থাকে। শীলার মামা, এম হকের কথাকে সবাই গপ বলে মনে করে হেসে উড়িয়ে দেয়। আসলে, এম হকের কথার, একটিও গপ নয়। তার জীবনে চমৎকার ফুটফুটে একটি পরীর মতো মেয়ে এসেছিলো, যে তাকে ভালোবাসতো মন প্রাণ দিয়ে। অথচ, সে তাকে বিয়ে করেনি। তার জীবনে, বি সি এস প্রশাসন ক্যাডারের মতো লোভনীয় একটা চাকুরীর সুযোগ এসেছিলো, সে যোগদান করেনি। এসবের কারন হলো, তার আত্মবিশ্বাসের অভাবে।

শীলার মামা এম হকের মেধা ভালো, অথচ, আত্মবিশ্বাস নেই। এইসব যে সত্য, তা নিশ্চিত জানে, শীলা আর শীলাদের পরিবারের সদস্যরা। এম হক, এম কম পাশ করে, ঢাকাতে একটা মেসে থেকে কিছুদিন, কিছুদিন বললে ভুল হবে, বছর পাঁচেক টিউশনি করে জীবীকা নির্বাহ করে, শেষ পর্যন্ত একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীর এসিসট্যান্ট ম্যানেজারের চাকুরী যোগার করেছে। সেই খুশীর সংবাদটা দিতেই এসেছিলো সেবার, সুদুর ঢাকা থেকে, চিটাগংয়ে শীলাদের বাড়ীতে।

এম হকের বোকামী আর পাগলামীর জন্যে, সে তার দুলাভাই তো দূরের কথা, নিজ বোনের কাছেও কোন মর্যাদা পায়না। তবে সে একটা বিশেষ মর্যাদা পায়, তার সুশ্রী, সুভাষীনী ভাগ্নী শীলার কাছে। সে যখন ঢাকা থেকে ক্লান্ত হয়ে চিটাগংয়ে বোনের বাড়ীতে বেড়াতে এসে, তাদের বসার ঘরে বসে আছে সময়ের পর সময়, তখন, কেউ তাকে চেহারাটা দেখাতেও এলোনা। সে বসার ঘরে একাকী বসে বসে তখন, দেয়ালের গায়ে টানানো একটা তৈল চিত্রের দিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিলো, ঠিক তখুনিই ট্রে ভর্তি চা নাস্তা নিয়ে ঢুকলো শীলা।

শীলা কিছুদিন পরেই এইচ এস সি পরীক্ষা দেবে। দেখতে দেখতে মেয়েটা যে, এত বড় হয়ে যাবে ভাবতে পারেনি এম হক। শীলা সোফার পাশে নাতিদীর্ঘ খাটো টেবিলটার উপর ট্রেটা নামিয়ে রাখতেই, এম হক বললো, ডিয়ার শীলা মামণি, দেয়ালের গায়ে ঐ পেইন্ট টা ঝুলছে কেনো? ঐটা তো কোন আর্ট মিউজিয়ামে থাকার কথা। এত দামী জিনিষ ঘরে থাকা তো ঠিক না।

শীলা অবাক হয়ে বললো, কি বলছো মামা?

এম হক শীলাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, নো, নো, আমাকে আর্ট শিখাবেনা! তোমার কাছে, আমি একটা অপদার্থ মামা হতে পারি, আর্ট বুঝার মতো চোখ, মাথা আমার আছে।

শীলা আবারো বললো, কি বলছো মামা?

এম হক বললো, বলছি যে, ঐটা একটা নামকড়া আর্টিষ্টের অরিজিনাল আর্ট। যার দাম তোমার জানা নেই। এই বাড়ীতে এটা থাকলে, বাড়ীতে যে কোন সময় ডাকাত পরতে পারে।

শীলা তার পাগলা মামার কথায় না হেসে পারলোনা। সে মজা করার জন্যে বললো, আচ্ছা মামা, বলোতো, ঐটা কার আর্ট?

এম হক বললো, তুমি কি ভেবেছো, নামকড়া আর্টিষ্টদের আমি চিনিনা?

শীলা, ওপাশের সোফায় বসে বললো, না তা বলছিনা, তবে বলেই ফেলোনা, ঐটা কার আর্ট?

এম হক বললো, রিয়াল টাইমে বলবো, না ব্যাক টু দ্য ফিউচারে বলবো?

শীলা চোখ কপালে তুলে বললো, ওটা আবার কি?

এম হক হাসলো, হাহ হা, ঠিক আছে, বলে ফেলি।

শীলা বললো, হুম, বলো!

এম হক বললো, ওটা হলো, ভবিষ্যতের একজন নামকড়া মহিলা আর্টিষ্টের।

একটা অপদার্থ মামার সাথে কথা বলতে গিয়ে, শীলার চেহারাটা কেমন যেনো অন্য রকম হয়ে গেলো। সে বললো, ভবিষ্যতের? নামকড়া? মহিলা আর্টিষ্টের? কে সে আবার?

এম হক খুব গর্ব করে বুক ফুলিয়ে বললো, সে হলো, নাদিয়া ইয়াসমীন, ওরফে শীলা।

শীলা বোকা বনে গেলো অনেকটা। সে সরাসরি বললো, ওটা তো আমার নাম!

এম হক হাসলো, হা হা, তাই তো বলছি।

শীলা অবাক হয়ে বললো, ওটা যে আমার করা, বুঝলে কি করে?

এম হক বললো, বুঝলাম কি করে? ঠিক আছে, কানে কানে বলি।

শীলা বললো, কানে কানে কেনো?

এম হক বললো, কারন আছে, কারন আছে, না হলে তুমি খুব কষ্ট পাবে।

শীলা তার এই একমাত্র মামাটির রহস্যে, বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই। সে তাড়াতাড়ি এই আপদ থেকে কেটে পরলেই বাঁচে। তাই সে কান পেতে দিলো। বললো, ঠিক আছে বলো?

এম হক ফিস ফিস করে বললো, আর্টটার নীচে তোমার সাইনটা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে।

শীলা মুখ ভ্যাংচালো, ধ্যাৎ মামা, ভেবেছিলাম, না জানি কি বলবে?

এম হক বললো, যাই বলো মামণি, তুমি নির্ঘাত বিখ্যাত হবে।

এম হক একটু থেমে বললো, মামণি, তোমরা তো কেউ আমার কথায় পাত্তা দাওনা। আমি বলি কি, এইচ এস সি পাশ করে, তুমি ভালো একটা আর্ট কলেজ অথবা ইদানীং ইন্যুভার্সিটিতে ফাইন আর্টস জাতীয় সাবজেকট গুলো আছে, সেগুলোতে ভর্তি হয়ে যাবে।

শীলা হাসলো, তোমাকে আমরা পাত্তা দিইনা, কথাটা ঠিক না, তুমি নিজেই নিজেকে দাম দাওনা। ঠিক আছে, তোমার কথাটা একদম ফেলে দেবোনা, ভেবে দেখবো। এবার চা টা খেয়ে নাওতো, জুড়িয়ে যাচ্ছে যে?

শীলা তার পাগলা অপদার্থ মামার কথামতোই ফাইন আর্টসে, অনার্সে ভর্তি হলো। অনার্স, এম এ শেষ করে যখন চাকুরীর চেষ্টাতে গেলো, ভালো সুবিধা করতে পারলোনা সে। তার পেছনে কি কারন থাকতে পারে শীলা নিজেই বুঝতে পারলোনা। তার মনে হলো, সে যে সব জায়গায় ইন্টারভ্যু দিচ্ছে, তারা কেউ তার আর্টকে বুঝতে পারছেনা। তা ছাড়া যুগ বদলে গেছে। সবকিছুই কম্পিউটারাইজড হয়ে গেছে। কম্পিউটার গ্রফিকস দিয়ে যেখানে চমৎকার নিখুত আর্ট করা যায়, সেখানে হ্যাণ্ড আর্টিস্টের দাম কোথায়? শীলা ভাবলো অন্য কথা। সে তার, নিজের চিন্তাভাবনা দিয়ে, নিজের ভেতরের লুকিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতীভা গুলোকে রূপান্তরিত করতে চাইলো অন্যদিকে। সে কাপরের দোকান থেকে নানান রকমের কাপর কিনে, বাড়ীতে বসে, সেগুলো মনের মতো করে ডিজাইনে কেটে, ফ্যাশন তৈরী করে, নমুনা নিয়ে যেতে শুরু করলো, ফ্যাশন শপ গুলোতে। তাতেও লাভ হলোনা। তার ডিজাইন কারো পছন্দ হলো না।

বাড়ীতে বসে বসে শুধু পয়সা নষ্ট করে, আইবুড়ু হয়ে যাচ্ছে বলে, তার মা বাবা, তার বিয়ের কথা ভাবলো। আর একদিন, হঠাৎ করেই এক বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যায় তার মা তাকে বললো, কাল তোমাকে দেখতে আসবে। ছেলেটা দেশের বাইরে পি এইচ ডি করছে। হাতে তার বেশী ছুটি নেই। পছন্দ করে ফেললে, বিয়েটাও সেরে ফেলতে চাই তাড়াতাড়ি।

শীলা অনুযোগ করতে চাইলো। কিন্তু, তার কথা শুনলো না কেউ। তার বাবাও বললো, আর না করিসনা মা, অনেক তো করলি, কিছুই তো হলো না। তোর শখের ব্যাপারগুলো তো বিয়ের পরও করতে পারবি। তা ছাড়া ছেলেটা ভালো। তুই একটু ভেবে দেখ।

শীলা মোটেও ভেবে দেখলোনা। সে পরদিন সকাল হবার আগেই, ঘর পালালো। মেয়েরা ঘর পালিয়ে কোথায় যায়, কি করে, কে জানে? শীলা পালিয়ে বেশী দূর যেতে পারলো না। সে পালিয়ে, চিটাগং থেকে ঢাকায় তার মামার বাসায় এসে উঠলো। তার মামাটি ব্যাচেলর বলে, সে কিংবা তার পরিবারের কেউ কখনো আসেনি। তাকে দেখে, তার মামা যেমনি অবাক হলো, তেমনি শীলা নিজেও অবাক হলো, একজন ব্যাচেলর মানুষের চমৎকার গুছানো একটা বাসা দেখে।

তার মামা এম হক বললো, বলা নেই কওয়া নেই, হুট করে চলে এলে, কি ব্যাপার?

শীলা হাসলো, কেনো? তোমাকে একটা চমক দেবার জন্যে?

এম হক বললো, না না, তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, একটা সমস্যা হয়েছে। ঠিক করে বলতো?

শীলা বললো, ধ্যাৎ মামা, টায়ার্ড হয়ে এলাম, কোথায় আমাকে কিছু খেতে দেবে, আর তুমি অযথা প্রশ্ন করছো?

এম হক বললো, খেতে তো দিবই, তার আগে, তুমি যে ঠিক মতো এখানে এসে পৌঁছেছো, বাড়ীতে একটা টেলিফোন করে দাও।

শীলা কথা প্যাচাতে পারেনা কখনো। তাই সে সরাসরি বললো, মামা, আমি ঘর পালিয়েছি।

এম হক অবাক হয়ে বললো, ঘর পলিয়েছো? কেনো?

শীলা বললো, আজকে কে নাকি আমাকে দেখতে আসার কথা।

এম হক বললো, তাতে কি? দেখতে আসতো, দেখে চলে যেতো। তোমার পছন্দ না হলে সরাসরি নো বলে দিতে?

শীলা চুপ করে রইলো।

এম হক বললো, বুঝেছি, তুমি ঠিক আমার মতো। বিয়ে করতে ভয় হচ্ছে তাই না?

শীলা রাগ করার ভান করলো, বললো, মামা, সবাইকে নিজের মতো করে ভাববেনা। তুমি একটা অপদার্থ, তাই বিয়ে করোনি। আর আমি একটা পদার্থ, তাই বিয়ে করতে চাইছিনা।

এম হক হাসলো, বললো, বুঝলাম। তাহলে, আমার এই বুদ্ধিমতী পদার্থ ভাগ্নীটি যে, মা বাবাকে একটা দুঃশিচন্তায় ফেলে দিয়ে এলো, তার কি হবে? পুলিশ, পত্রিকা করে যদি একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে, তখন কেউ তোমাকে আর পদার্থ বলবেনা, আমিও না।

শীলা বললো, ধ্যাৎ মামা, বোকামী হয়ে গেছে বুঝলাম। তুমি তাহলে মাকে একটা টেলিফোন করে দাও। আমি পারবোনা।

এম হক বললো, ঠিক আছে আমি এক্ষুণি করছি। এই ফাঁকে তুমি গোসলটা সেরে ফেলো, তারপর বাইরে একটা ভালো রেষ্টুরেন্টে খেতে যাবো।

শীলা বললো, বাইরে খেতে যাবো কেনো? তোমার বাসায় কি খাবারের আয়োজন নেই?

এম হক বললো, থাকবেনা কেনো, ব্যাচেলর মানুষ, মাঝে মাঝে একটা ডিম পোজ করে সেরে ফেলি। তুমি এসব খেতে পারবেনা।

শীলা বললো, তাহলে ঘরে বুঝি ডিম ছাড়া কিছুই নাই, তাইতো?

এম হক রাগ করলো, তুমি তো বেশী প্যাচাল পারো? মুরগী, গরু, খাসীর মাংস, সবিজ সবই আছে ফ্রীজে। তোমার ইচ্ছে হলে রান্না করে খাও। আমার রান্না তোমার ভালো লাগবেনা।

এম হক, শীলার মা বাবাকে একটা টেলিফোন করে তাদেরকে নিশিচত করলো আগে। শীলা গোসল শেষে, ঠিকই রান্না করতে গেলো, রান্না ঘরে। শীলার রান্না বান্নার ফাঁকে, এম হক, তার কম্পিউটার নিয়ে বসলো।

শীলা খাবার রেডী করে তার মামাকে ডাকলো। এম হক, কম্পিউটারে চোখ রেখেই বললো, তুমি শুরু করো, আমি এক্ষুনি আসছি।

শীলার পেট ক্ষুধায় চোঁ চোঁ করছে। তার মামা, এক্ষুণি আসছি বলেও, সহজে আসছেনা। সে তার মামার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললো, কি করছো মামা?

এম হক বললো, তোমার জন্যে একটু খোঁজাখোঁজি করছি।

শীলা রাগ করার ভান করে বললো, মামা তুমিও? তোমরা সবাই কি আমাকে বিদায় করতে পারলে বেঁচে যাও, তাই না?

এম হক বললো, আরে না, তোমার জন্যে পাত্র খোঁজ করছিনা। খোঁজ করছি তোমার প্রতীভাকে বিকাশ করার একটা পথ। ঠিক আছে, আগে খেয়ে নিই। আমি ইন্টারনেটের কয়েকটা ওয়েবসাইট বুকমার্ক করে রেখেছি। পরে একসংগে দেখবো।

খেতে খেতে এম হক বললো, আচ্ছা তোমার ইংরেজীর উপর দখল কেমন বলোতো?

শীলা বললো, জেরো। এইচ এস সি পরীক্ষাতে দু পেপার মিলে, কোন রকমে পাশ মার্ক ছিলো। কিন্তু কেনো? তুমি আমাকে বিদেশে পাঠানোর কথা ভাবছো নাকি?

এম হককে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। সে বললো, তোমার যে প্রতীভা, তার বিকাশের সবচেয়ে ভালো জায়গা হলো ফ্রান্স। কিন্তু, সেখানে যেতে হলে, প্রথম দরকার ফরাসী ভাষা জানা। বাট, আমি যতদূর জানি, ভাষা জানলেও, এসিয়ানরা সেখানে ভালো মূল্যায়ন পায়না। অন্য সব দেশে, ইংরেজীর উপর দক্ষতা, ন্যাটিভ লেভেলের চায়।

শীলা বললো, মা বাবা কি আমাকে দেশের বাইরে যেতে দেবে, একা একা?

এম হক বললো, তুমি তো আর বাচ্চা মেয়ে না? যে মেয়ে ঘর পালিয়ে এখানে চলে আসতে পারে, তার জন্যে ব্যাপারটা কঠিন বলে আমার মনে হচ্ছেনা। আপা দুলাভাইকে আমি ম্যানেজ করবো, তার আগে দেখো ভালো কিছু খোঁজে পাওয়া যায় কিনা?

সুপ্রিয় পাঠক পাঠিকা, এতক্ষণ যে প্যাচাল পারলাম, তা হলো এই গল্পের ভুমিকা। আমার এই গল্পের শুরু হলো এখান থেকে। শীলা, সুবোধ বালিকার মতোই, পরদিন ঢাকা থেকে ফিরে গেলো চিটাগংয়ে, নিজের বাড়ীতে। সে তার পাগলা মামার সহায়তায়, ইন্টারনেট থেকে কয়েকটা ঠিকানা সংগ্রহ করে, তার কৃতকর্মের নমুনা পাঠিয়ে চিঠি লিখলো, বিভিন্ন দেশের, কয়েকটা ডিজাইন কোম্পানীতে। আর, তার পাশাপশি ইংরেজীটা শিখতে লাগলো ভালো করে।

অধিকাংশ চিঠিরই উত্তর এলোনা। না বোধক উত্তর এলো কয়েকটার। জাপানের সানকিয়ো নামের এক ডিজাইন কোম্পানী থেকে উত্তর এলো, জাপানে এসে তার কৃতকর্মের উপর একটা পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষায় দক্ষতা দেখাতে পারলে, তিন মাসের শিক্ষানবীশ কোর্স বাধ্যতামূলক, তার জন্যে শিক্ষানবীশ হিসেবে ভাতা দেয়া হবে। তারপর স্হায়ী চাকুরী, ডিজাইনার হিসেবে। শীলা, এই অফারটাতে, চোখ বন্ধ করে রাজী হয়ে গেলো। সে আর দেরী না করে উত্তর পাঠালো, কখন তাকে পরীক্ষা দিতে যেতে হবে।

ওসাকা কানসাই এয়ারপোর্টে এসে, ইমিগ্রেশন আর লাগেজ চেক আউট করে এরাইভাল লাউঞ্জে এসে যখন পৌঁছুলো, তখন ভোর সাতটা। শীলা দেখলো, শত শত অভ্যর্থনাকারীরা অপেক্ষা করছে, নিজ নিজ পরিচিত জনদের রিসীভ করতে। কেউ কেউ প্লে কার্ড হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অপরিচিত চেহারার মানুষগুলোকে রিসীভ করার জন্যে। শীলা আশা করেছিলো, তার জন্যেও হয়তো এমন একটি প্লে কার্ড হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে কেউ, রিসীভ করার জন্যে। অথচ, এমন কাউকে চোখে পরলোনা। সে অসহায়ের মতো, এদিক সেদিক তাঁকাতে থাকলো শুধু।

সাড়ে আটটার দিকে যে মেয়েটি তার দিকে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এলো, সে মেয়েটিকে দেখে, তার বয়স বুঝা যায়না। হঠাৎ দেখলে মনে হয় সতের আঠারো। মেয়েটি তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বেড় করে দিয়ে যা বললো, তার কিছুই বুঝতে পারলোনা সে। তবে কার্ডখানা হতে নিয়ে তার উপর লিখাগুলো পড়ে বুঝতে পারলো যে, তার নাম ইয়াদা আয়া। এবং সানকিয়ো ডিজাইনস এর প্রোপাইটার। প্রথম পরিচয়ে জাপানীজদের কি কি বলতে হয় শিখেছিলো, শীলা। অথচ, এই মুহুর্তে কিছুই মনে আসছেনা তার। শীলা ইংরেজীতেই বললো, নাইস টু মীট ইউ।

মেয়েটি শীলার কথার কোন পাত্তা দিলোনা। সে শীলার লাগেজ টানতে টানতে আরো কি কি বললো। শীলা শুধু, স্যরি, পারডন, বলে এগিয়ে চললো, তার পেছনে পেছনে।

এয়ারপোর্টের তিনতলার কার পার্কিং স্পেসে এসে, বিশাল সাদা রংয়ের সেভেন সীটেড একটা মডার্ন কারের পেছনের লাগেজ বক্সে, শীলার লাগেজগুলো উঠিয়ে রেখে, গাড়ীর সামনের বামদিকের দরজাটা খোলে, শীলাকে বসতে বললো গাড়ীতে, আয়া। শীলা বসতেই, মেয়েটি হাত ইশারা করে কি যেনো বললো। শীলা তার কিছুই বুঝতে পারলোনা। মেয়েটি চেহারায় বিরক্তি নিয়ে, অনেকটা শীলার গায়ের উপর ঝোঁকে পরে তার সীটের, সীট বেল্টটা টেনে, বেঁধে দিলো। দেশে, শীলাদের নিজেদেরও গাড়ী আছে, সীট বেল্ট নিয়ে কখনো ভাবেনি কেউ। মেয়েটির এমন একটি ভাব দেখে, শীলার বেশ রাগ হলো।

এয়ারপোর্ট থেকে বেড়িয়ে গাড়ী চললো পংখীরাজের মতো, চমৎকার হাইওয়ের উপর দিয়ে। গাড়ী চালাতে চালাতে মেয়েটি অনেক কথাই বললো। শীলার মনে হলো, কথাগুলো ইংরেজী, তবে নিজের অজানা ইংরেজীই হউক, আর জাপানীজ ভাংগাচুরা ইংরেজীই হউক, সে কিছুই বুঝতে পারলোনা।

আড়াই ঘন্টা ড্রাইভিংয়ের পর ওসাকা অঞ্চলের, ওসাকা সিটিতে এসে পেঁছুলো শীলা। গাড়ী থেকে নেমে, আয়া নামের মেয়েটির পেছনে পেছনে, ঢুকলো একটি রেষ্টুরেন্টে। উভয়পক্ষের ইংরেজী যদি ভাংগাচুড়া হয়, তাহলে বুঝে উঠা অনেকটা সহজ হয়ে পরে নাকি, কে জানে? শীলা, আয়া নামের এই মেয়েটির ভাংগাচুড়া ইংরেজী, কিছুটা হলেও বুঝতে শুরু করলো। মেয়েটি রেষ্টুরেন্টে বসার পর যা বললো, তার বাংলা অর্থ করলে এই হয় যে, এটি একটি ইণ্ডিয়ান রেষ্টুরেন্ট। এই ধরনের রেষ্টুরেন্টে আসা তার জন্যে জীবনে প্রথম। বাংলাদেশীরা তরকারী খেতে পছন্দ করে বলে, শীলার সৌজন্যে এই রেষ্টুরেন্টে এসেছে।

শীলা তাকে ধন্যবাদ জানালো। মেয়েটি রেষ্টুরেন্টের খাবারের মেন্যু শীলার হাতে তুলে দিয়ে বললো, এবার কি খাবে পছন্দ করো?

শীলা মেন্যুতে ছবি আর দাম দেখে একটা সস্তা তরকারী আর এক পিস নানের কথা বললো। আয়া অবাক হয়ে বললো, তুমি কি, এটা খেতে পারবে? এতে কিন্তু শুকরের মাংস আছে।

ভিন দেশে যে শুকরের মাংস খাবার প্রচলন আছে, ব্যাপারটা কখনো ভাবেনি শীলা। শীলা একজন মুসলিম হিসেবে শুকরের মাংস খাওয়াটা নিষিদ্ধ ব্যাপার, তা সত্য। কিন্তু, জানা নেই শুনা নেই এই মেয়েটির সতর্কে, সত্যিই অবাক না হয়ে পারলোনা সে। সে বললো, আমি যে শুকরের মাংস খাইনা, কি করে জানলে তুমি?

আয়া বললো, তোমাকে এখানে আসার কথা সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে, বাংলাদেশের উপর একটু লেখাপড়া করেছি। তোমাদের দেশে তো গাড়ী নাই তাইনা? খালি রিক্সা।

বাংলাদেশে গাড়ী নাই কথাটি বলাতে, শীলা খুবই অবাক হলো। কি লেখাপড়া করেছে সে, কে জানে, বাংলাদেশের উপর? অধিকাংশ পুরনো হলেও, বাংলাদেশের রাস্তায় তো গাড়ীও চলে। শীলা তর্ক করতে গেলোনা।

শীলার খাবারের রুচি অনেকটা নষ্ট হয়ে গেলো, ঐ শুকরের মাংস বলাতে। সে বললো, আমি শুধু জ্যুস পান করবো এক গ্লাস।

আয়া বললো, শুধু জ্যুস পান করবে কেনো? তুমি খেতে পারো, এমন অনেক খাবার এখানে আছে। আপাততঃ ভেজিটেবল জাতীয় কিছু খেতে পারো।

শীলা বিনয়ের সাথে বললো, আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা, কোনটাতে কি মেশানো আছে।

আয়া হাসলো, বললো, ঠিক আছে, আমি তোমাকে পছন্দ করে দিচ্ছি, তোমার যদি ভালো না লাগে, তাহলে ক্ষমা করবে।

খাবারের প্রতি আসক্তি শীলার কখনোই ছিলোনা, আর তাই অনেকটা অরুচি করে খাবার শেষ করলো সে।

রেষ্টুরেন্ট থেকে বেড়িয়ে, আবারো গাড়ীতে উঠে বসতেই আয়া ইশারা করলো, সীট বেল্ট বাঁধার জন্যে। তারপর, বিড়বিড় করে কিছু কথা বললো। মেয়েটি বিড় বিড় করে যা বললো, তার অর্থ এই হয় যে, এই মেয়ের জন্যে, আমার লাইসেন্সটা যেনো বাতিল না হয় আবার।

মিনিট দশেকের মাঝে যেখানে এসে গাড়ী থামলো, সেটি একটি কমার্শিয়াল এলাকার মতো, যেখানে সারি সারি অনেকগুলো দ্বিতল থেকে শুরু করে বহুতলী ভবন দাঁড়িয়ে আছে, প্রশস্ত রাস্তার দুপাশে। আয়া তেমনি একটা বহুতলী ভবনের আণ্ডার গ্রাউণ্ড পার্কিং স্পেসে গাড়ী থামিয়ে, শীলার লাগেজ গুলো নিজেই নামালো গাড়ীর ভেতর থেকে। বড় লাগেজটা টেনে এগুতে থাকলো সে, এলিভেটরের দিকে। শীলা তার ভ্যানিটি ব্যাগ আর মাঝারী সাইজের লাগেজটা নিয়ে তার পেছনে পেছনে এগুলো।

শীলা বুঝতে পারলো, এটি একটি হোটেল। আয়া বললো, আমি খুবই দুঃখিতো যে, তোমার জন্যে, একটি ভালো হেটেলে থাকার ব্যাবস্হা করতে না পারায়।

হোটেলের ভালো মন্দে, শীলার খুব একটা ভালো ধারণা নাই। তবে, এই হোটেলটির সুরৎ দেখে মনে হলো, বাংলাদেশের তারকা সম্বলিত হোটেলগুলোর চাইতেও মান অনেক উন্নত। এই হোটেলে থাকার ব্যাবস্হার জন্যে শীলা মোটেও অতৃপ্ত নয়।

শীলার থাকার ব্যাবস্হা হলো, পাঁচতলার পাঁচশ নয় নম্বর কক্ষে। আয়া, শীলাকে তার কক্ষ বুঝিয়ে দিয়ে বললো, পাঁচশ ছয়ে, আছে ফ্রান্স থেকে আসা, জুলিয়ানা। বিকাল থেকে শুরু করে, রাতের মাঝে, জাপানের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসবে আরো চারজন মেয়ে। আর আমেরিকা থেকে আসবে আর একজন, আজ রাতেই। সবার থাকার জায়গা, এই ফ্লোরেই। সবার রুম নম্বরের লিষ্ট এখানে আছে। যদি বোর লাগে, তাহলে তাদের সংগে গল্প করবে।

তারপর সে, হেটেল কক্ষের ভেতরে ঢুকে, একটি চেয়ারে বসে, তার ব্যাগের ভেতর থেকে কিছু কাগজ, আর একটি খাম বের করে শীলার হাতে দিলো। বললো, খামের ভেতরের ইয়েনগুলো গুনে, এই কাগজগুলো ভালো করে পড়ে, এই কাগজে একটি সাইন করো।

শীলা কাগজগুলো পড়ে, খামের ভেতরের ইয়েনগুলো না গুনেই, সাইন করতে গেলো। আয়া বললো, আগে ভালো করে গুনে দেখো। ছেচল্লিশ হাজার তিনশ বারো ইয়েন আছে কিনা। তোমার দুপুরের লাঞ্চে খরচ হয়েছে, তিন হাজার ছয়শ অষ্টাশি ইয়েন। সব মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজার ইয়েন।

শীলা ইয়েনগুলো গুনতে গুনতে, মনে মনে হাসলো, দুপুরেরর লাঞ্চটি তাহলে নিজের জন্যে বরাদ্দ করা টাকাতেই?

আয়া তারপর বললো, আমাকে এখুনি একটু অফিসে যেতে হবে, তারপর আবার এয়ারপোর্ট। কাল সকাল নয়টার আগে আর, তোমার সাথে দেখা হবেনা। রাতের খাবার ইচ্ছা করলে, হোটেলেও খেতে পারো, অথবা, পাশে একটি ভালো রেষ্টুরেন্টও আছে। সেখানেও যেতে পারো।

পরদিন সকালে, হোটেলের একটি মাঝারী সাইজের বাসে করে, আয়াকে অনুসরন করে, সবাই রওনা হলো, পরীক্ষা দেবার স্হানে। বাস এসে থামলো, অনেকটা খোলামেলা একটা জায়গায়, চমৎকার বিশাল এক হলের সামনে। হলের ভেতরে ঢুকে, সবাইকে একটি কক্ষের ভেতর বসতে বলে, আয়া ছুটে গেলো অন্যত্র।

দশটা থেকে পালাক্রমে সবার ইন্টারভ্যু শুরু হবার কথা। বিকাল, একটা থেকে হাতের কাজ। চারজনের ইন্টারভ্যুর পরই, শীলার ইন্টারভ্যু। শীলার বুকটা কাঁপছে, এক অজানা লক্ষ্যের সফলতা আর ব্যার্থতার কঠিন মুহুর্তগুলোর জন্যে।

ইন্টারভ্যু বোর্ডে আয়া সহ চারজন। অন্য তিনজনের মাঝে একজন মহিলা, যার বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ। সে ই, ডিজাইনের উপর কিছু প্রশ্ন করলো। অন্যেরা করলো, মামুলী ধরনের কিছু প্রশ্ন। যেমন, বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত? গরম কেমন পরে? শীতে তুষারপাত হয় কিনা? ইত্যাদি। একজন বললো, আমি তোমাদের দেশে গিয়েছিলাম। এয়ারপোর্টে নামতেই একদল মানুষ এসে, আমার কাছে হাত পেতে ধরলো। আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তোমাদের দেশে তো অনেক লোক গরীব, তাই না?

শীলার মনে হলো, তারা যেনো, বাংলাদেশকে নিয়ে অনেকটা রসিকতা করছে। শীলার লজ্জা লাগলো খুবই ইন্টারভ্যু বোর্ডে।

বিকালে হাতের কাজের উপর পরীক্ষার জন্যে, সবাইকে নিয়ে যাওয়া হলো, একটা বিশাল হল কক্ষে। টেবিল টেনিসের টেবিলের সাইজের, বেশ কয়েকটা টেবিলের উপর, অনেক ধরনের কাপর, কাঁচি, সুই, সূতা থেকে শুরু করে, যাবতীয় সেলাই সরঞ্জাম সাজানো আছে। আয়া ঘোষনা করলো, প্রতিটি টেবিলে, কাগজের উপর নাম লেখা আছে। তোমরা তোমদের নিজ নিজ টেবিল খোঁজে বেড় করো। আমি শুরু করতে বললেই, শুরু করবে, নিজ নিজ মনের মতো ডিজাইন। সময় দু ঘন্টা।

আয়া শুরু করতে নির্দেশ দিতেই, সবাই কাঁচি দিয়ে ক্যাচ ক্যাচ করে কাপর কাটতে লাগলো। শীলা শুরু করতে পারছেনা। সে তার মনের মতো কয়েকটা ডিজাইন ভেবে রেখেছিলো, কিন্তু একটাও মনে করতে পারছেনা এই মুহুর্তে। সে কি করবে কিছুই বুঝতে পারছেনা।

হল কক্ষের ভেতর, চার চার জন মানুষ পায়চারী করছে, সবার মনোভাব আর অগ্রগতি পর্যবেক্ষন করার জন্যে। সময় প্রায় আধ ঘন্টা পার হয়ে গেছে। শীলা রীতিমতো ঘামছে। সে তখনো কিছুই ঠিক করতে পারছেনা, কি ডিজাইন করবে সে। তার কাঁদতে ইচ্ছে হলো। আয়া তার কাছে এসে বললো, সময় বাড়ানো হবেনা, নির্ধারিত সময়ের মাঝেই করতে হবে সব। তাই সতর্ক থাকো, সময়ের ব্যাপারে।

শীলা কাপর কাঁটতে শুরু করলো। তার হাত কাঁপছে। হাতের কাঁপুনি আর অসতর্কতায়, কাপরের মাঝখানে কাঁচির একটা খোঁচা লেগে গেলো। জাপানীজদের চোখ শকুনের মতো। ব্যাপারটা, প্রায় ছাপপান্ন বছরের ঐ পর্যবেক্ষকটির চোখকে ফাঁকি দিতে পারলোনা। লোকটি হতাশ হবার মতো একটা চেহারা করলো।

শীলা আবারো শুরু করলো নুতন উদ্যমে। কাপর কেটে, সেলাই শেষ করে, ভাবছে, কাঁচির খোঁচা লাগা অংশটার কথা। সে যে পোষাকটা বানিয়েছে, খোঁচা লাগা অংশটা ঠিক সেই পোষাকের কোমরের কাছাকাছি একটা জায়গায়। শীলা, উচ্ছিষ্ট টুকরো কাপরগুলো থেকে একটা বড় টুকরা বেছে নিয়ে রুমালের মতো তৈরী করলো।

যথারীতী সময় শেষ হলো। সবাই নিজেদের তৈরী করা পোষাকগুলো, ঐ পাশে সারি করে দাঁড় করিয়ে রাখা, নগ্ন নারী মূর্তিগুলোর গায়ে পরিয়ে দিয়ে, নিজেরা পাশে দাঁড়ালো। পর্যবেক্ষকরা এক নজর তাঁকিয়ে ফিরে গেলো অন্যত্র।

বিকাল সাড়ে চারটায়, অন্য একটি হল কক্ষে, সবাইকে বসিয়ে ফলাফল ঘোষনা করা হলো। ঘোষনা করলো আয়া নিজেই। সে অনেকটা ক্ষমাসূচক ভাবে বললো, সত্যিকার অর্থে, সবার ডিজাইনই চমৎকার হয়েছে। তবে আমাদের ডিজাইনার দরকার, মাত্র একজন। তাই, এবার সবার মধ্য থেকে মাত্র একজনকেই নির্বাচন করা হয়েছে।

সবাই এক ধরনের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে শুনছিলো, আয়ার কথা। শীলার মনে কোন চঞ্চলতা নেই। কারন, সে নির্ঘাত জানে, এই যাত্রায় তাকে ব্যার্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে যেতে হবে নিজের দেশে। শুধু তাই নয়, সে ভাবছে, যত তাড়াতাড়ি পারে, এই কক্ষ ত্যাগ করতে।

অবশেষে, আয়া ঘোষনা করলো, নির্বাচিত ডিজাইনারের নাম। শীলা, তার ঘোষনাতে কোন আগ্রহ প্রকাশ করলোনা। আয়া, তারপর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের মহিলা ডিজাইনার তানাকা মাইউমিকে বললো কিছু বলার জন্যে। তানাকা মাইউমি ভালো ইংরেজী জানেনা। সে তার বক্তৃতা দিলো, জাপানীজে। মাত্র তিনজন বিদেশী মেয়ের জন্যে, আয়া সংক্ষেপে তার বক্তৃতার কথাগুলো ব্যাখ্যা করলো, ইংরেজীতে। যার অর্থ এই হয় যে, ডিজাইন নিজের মনের মতো না হয়ে, হতে হবে অন্যের মনের মতো করে তৈরী করা। নিজের কাছে যা ভালো লাগে, অন্যের কাছে তা ভালো নাও লাগতে পারে। তোমাদের মধ্যে যারা নির্বাচিত হতে পারোনি, তাদের হতাশ হবার কোন কারন নেই। তোমাদের সবারই চমৎকার কৌশল আছে বলে, আমি মনে করি। তবে, আমার একটাই পরামর্শ, গ্রাহক, ক্রেতারা কি চায়, সে ব্যাপারে আরো মনযোগী হতে হবে।

সবশেষে ভাষণ দিলো, কিউ এস স্পিন ফাণ্ডের পদস্হ কর্মকর্তা কোনিশি এইচি। সে তার ভাষন প্রথমে জাপানীজে শেষ করে, ইংরেজীতে বলতে লাগলো, আমরা আসলে, ব্যাবসায়ীক দৃষ্টিকোন থেকে, এবারের ডিজাইনারকে নির্বাচিত করেছি। সানকিয়ো ডিজাইনসের পুরু স্পন্সর হলো আমাদের। আমি চাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, বিনিয়োগের অর্থ যেনো ফিরে আসে। আর তাই, চমৎকার ডিজাইন দেখে নয়, আমরা নির্বাচন করেছি, অধ্যবসায়ের ক্ষমতা যার অধিক তাকেই। কৌশল, দক্ষতা অনেকেরই আছে। কিন্তু আমরা দেখেছি, কে কেমন করে, তাদের কৌশল, দক্ষতা দেখাতে পেরেছে। আমাদের নির্বাচিত, নাদিয়া ইয়াসমিনের মাঝে এমন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য খোঁজে পেয়েছি, যা বিজনেস ফিল্ডে খুবই দরকারী।

শীলা খুবই অমনোযোগী হয়ে শুনছিলো, লোকটির কথা। হঠাৎ, নিজের নামটি শুনে খুবই অবাক হলো। তাহলে কি সে নির্বাচিত হয়েছে, ডিজাইনার হিসেবে? সে খুবই মনোযোগ দিলো এবার লোকটির কথায়।

লোকটি আরো বললো, তোমরা সবাই অনেক দূর থেকে, অনেক কষ্ট করে, অনেক আশা নিয়ে, এখানে এসেছো। এতে হতাশ হবার কিছু নেই। সব বিজনেস কোম্পানীর চিন্তা ভাবনা এক নয়। তোমরা আবারো নুতন উদ্যমে চেষ্টা চালিয়ে, যাবে, এই আশা করছি।

ফলাফল ঘোষনার পর শীলাকে ডাকা হলো, অন্য একটি বিশেষ কক্ষে, যেখানে কিউ এস স্পিন ফাণ্ডের কর্মকর্তা কোনিশি এইচি বসে আছে, একটি গোল টেবলের পাশে। শীলাকে চেয়ারে বসতে বলে, আয়া নিজেও বসলো। তারপর বললো, তুমি কখন থেকে কাজে যোগদান করতে পারবে?

শীলা কি বলবে, কিছু বুঝতে পারছে না। সে বললো, তোমরা যখন থেকেই বলো, আমার আপত্তি নেই।

আয়া বললো, পরশু দিন তোমার রিটার্ন টিকেট। তুমি ইচ্ছে করলে একবার দেশ ফিরে গিয়ে আবারো আসতে পারো। তবে আমাদের লোক দরকার খুব শিগগীরই। আমাদের টার্গেট হলো, পরবর্তী সামারের মার্কেট। তাই বুঝতেই পারছো, ফিরে গিয়ে, বেশীদিন থাকা যাবেনা।

আয়া একটু থেমে বললো, তোমাকে একদিনের সময় দেয়া হলো, আগামীকাল বিকাল পাঁচটার মধ্যে, আমাকে জানাবে, কবে থেকে যোগদান করতে পারবে?

জাপানে নিজের সফলতা, আর কাজে যোগদানের ব্যাপারে, রাতে টেলিফোন করলো শীলা, তার মা বাবার কাছে। তার মা বাবা, হা অথবা না, কোন ধরনের মন্তব্য করলোনা। শীলা টেলিফোন করলো, তার মামাকে। তার মামা, তাকে অভিনন্দন জানিয়ে পরামর্শ দিলো, সরাসরি যোগদান করতে।

শীলা কাজে যোগ দিয়ে, যা দেখলো, আয়াকে নিয়ে সানকিয়ো ডিজাইনসের কর্মী হলো দুজন। শীলাকে ধরলে হবে তিনজন। অন্যজন একটি মেয়ে, কোবায়াসী হিতোমী। প্রথম দিনে, দ্বিতল ভবনের, পুরু অফিসটা ঘুরিয়ে দেখালো, হিতোমী। অফিস কক্ষটা বাদ দিলে, অন্য সব গুলো কক্ষই হলো অনেকটা গবেষনাগারের মতো। কাপর কাটা থেকে শুর করে, সেলাই, আইরনের নানান রকমের অত্যাধুনিক ইন্সট্রুমেন্ট। ঘুরিয়ে দেখানো শেষ হতেই, হিতোমী বললো, এবার তুমি নিজে নিজে ঘুরে ঘুরে দেখো কোন মেশিনের কি কাজ?

চার কক্ষের ছোট একটা প্রতিষ্ঠান, পনের মিনিট ঘুরলেই সব দেখা হয়ে যায়। শীলা, আর একবার ঘুরে, অফিস কক্ষে ফিরে এসে, তার জন্যে নির্ধারিত চেয়ারে এসে বসলো। সে দেখলো, আয়া এবং হিতোমী, খুবই মনোযোগী হয়ে, নিজ নিজ কম্পিউটারে কি যেনো করছে। শীলার টেবিলেও একটি কম্পিউটার আছে। কম্পিউটারের উপর ভালো জ্ঞান নাই বলে, সে তার ভ্যানিটি ব্যাগে রাখা, ডিজাইনের উপর কয়েকটা বই বেড় করে টেবিলের উপর রাখলো। তারপর, একটি বই খোলে পড়তে লাগলো।

লাঞ্চের পরও কোন কাজের নির্দেশ না পেয়ে, শীলা, তার চেয়ারে বসে, ডিজাইনিংয়ের উপর, একটা বই খোলে পড়তে লাগলো। প্রায় আধ ঘন্টা পর, হিতোমী, শীলাকে ভেতরের গবেষনাগারে ডেকে নিয়ে বললো, তোমাকে কি বলেছিলাম?

শীলা অবাক হয়ে বললো, কই, কিছু তো বলোনি?

হিতোমী চোখ লাল করে বললো, তোমাকে বলিনি, সবগুলো কক্ষ ঘুরে দেখতে?

শীলা হাসলো, বললো, হুম, তাতো ঘুরে দেখলাম।

হিতোমী রেগে বললো, তাহলে বলতো, স্পাইরাল মেকারটা কোথায় আছে?

শীলা হতভম্ব হয়ে গেলো। সে অনেক ধরনের মেশিন দেখেছে। কোনটার কি নাম মুখস্হ করার চেষ্টা তো করেনি সে।

শীলা বিনয়ের সাথে বললো, দুঃখিতো, বলতে পারবোনা।

হিতোমী মুখ খিচিয়ে বললো, এখানে বসে থাকার জায়গা না। কেউ তোমাকে কিছু শিখিয়ে দেবেনা। নিজে নিজেই শিখতে হবে সব।

হিতোমীর কঠিন আচরনে, শীলার মনটা খারাপ হয়ে গেলো। সে আবারো গেলো, পরিদর্শনে।

বিকাল তিনটায়, কুমামতো থেকে টেলিফোন এলো। টেলিফোন রিসীভ করতেই ওপাশ থেকে বললো, আমি রাজীব, আপনার মামা, আমার খালুর এক বন্ধু। উনিই আমাকে আপনার টেলিফোন নম্বর দিয়েছে।

শীলা বললো, কুমামতো কোথায়?

রাজীব বললো, অনেক দূর। ওসাকা থেকে প্লেনের পথ। দ্রুততম ট্রেনে ছয় ঘন্টার মতো।

টেলিফোন করার ফাঁকে শীলা লক্ষ্য করলো, হিতোমী ঈগলের মতো তাঁকিয়ে আছে তার দিকে। হিতোমীর চেহারাটা দেখে শীলার টেলিফোনে আলাপ করে ইচ্ছাটা লোপ পেলো সাথে সাথে। সে সদ্য টেলিফোনে পরিচিত, রাজীবকে বললো, এখন একটু ব্যস্ত, পরে আলাপ করবো।

শীলা টেলিফোন রেখে দিলো। পরে আলাপ করবে বলেছে ঠিকই, অথচ, টেলিফোন নম্বরটা পর্যন্ত নেয়া হলোনা। মনটা আরো খারাপ হয়ে গেলো শীলার।

সাড়ে চারটায় আবারো টেলিফোন আসলো। নিশ্চয় ঐ রাজীব নামের লোকটা হবে। শীলা কাগজ কলম নিয়ে রেডী হয়ে, টেলিফোন রিসীভ করলো। টেলিফোন করলো, এক মহিলা। কিয়োতো থেকে, মিসেস শামীম। সে বললো, রাজীব ভাই আপনার নম্বর দিয়েছে। আমার হাসব্যাণ্ড আর রাজীব ভাই দুজনেই এগ্রি ইন্যুভার্সিটি থেকে এখানে পি এচি ডি করতে এসেছে। ওসাকাতো আমাদের কাছেই, গাড়ীতে ঘন্টা খানেকের পথ। আসুন না একবার বেড়াতে।

শীলা পরবর্তীতে যোগাযোগ করবে বলে, মিসেস শামীম থেকে, তার টেলিফোন নম্বরটি টুকে নিলো।

হিতোমীকে যতটা কঠিন প্রকৃতির মনে হয়েছিলো, সে ততটা কঠিন নয়। দুদিন পরই, হিতোমী বললো, এখানে নবীনদের বরন করার একটা প্রথা আছে। তুমি আমাদের অফিসে নবীন। আগামী শুক্রবার সন্ধ্যায় তোমার উদ্যেশে পার্টির আয়োজন করা হবে। খাবার দাবারের ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা থাকলে জানাবে কি?

শীলা বিনয়ের সাথে বললো, আমার জন্যে খাবার বাছার কোন দরকার নেই। খাবারের প্রতি আমার কোন আসক্তি নেই। তোমরা তোমাদের মতো আয়োজন করো। তার মাঝে, পছন্দের কিছু থাকলে খাবো।

হিতোমী বললো, তা ঠিক, পার্টি হবে তোমার উদ্যেশে, তুমি যদি পেট ভরে খেতে না পারো, পান করতে না পারো, পার্টি করার কোন মানে হয় না।

শীলা হাসলো, বললো, ঠিক আছে, আমি শুকরেরর মাংস খাইনা, আর অক্টোপাস খাইনা। এলকোহল পান করিনা।

শীলার নবীন বরন পার্টিতে, প্রচুর সময় নষ্ট করে এলো, কিউ এস স্পিন ফাণ্ডের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা। সবাই তাকে বিদেশী একটি মেয়ে হিসেবে, অধিকতর অভিনন্দন জানালো। শীলার মনটা ভরে গেলো তাতে। বিয়ার পান করার মধ্য দিয়ে শীলাকে বরন করে নেয়া হলো। খাবার দাবারের এক পর্যায়ে হিতোমী বললো, সবাইকে বিয়ার ঢেলে দিচ্ছোনা কেনো? এটা জাপানীজ সাধারন ভদ্রতা। শীলা, বিয়ারের বোতল নিয়ে এগিয়ে গেলো সবার পাশে।

ডিজাইনিংয়ের প্রতিভা বিকাশের জন্যে এসে, ডিজাইনিংয়ের কিছুই শিখা হচ্ছে না শীলার। তাকে শিখতে হচ্ছে নানান রকমের ইন্সট্রুমেন্টের ব্যাবহার, পরিচালনা, বিজনেস পলিসি, আর ভিন দেশী একটি ভাষা। এরই মাঝে আয়া তাকে কমিশন করলো, ড্রাইভিংটা শেখার জন্যে। কারন, ফ্যাশনের নমুনা নিয়ে যেতে হবে সারা জাপানের বিভিন্ন সুপার মার্কেট, ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর আর ফ্যাশন শপ গুলোতে। নিজের করা ডিজাইন নিয়ে অন্য কেউ প্রচারে যাবেনা। নিজের প্রচার নিজেকেই করতে হবে। আর সুপার মার্কেট, ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর আর ফ্যাশন শপ গুলোর অধিকাংশই, ট্রেন ষ্টেশন অথবা বাস স্টপ থেকে অনেক দূরে। তাই, ড্রাইভিং ছাড়া, এখানে জীবন যাপন অচল।

এক ধরনের কঠিন জীবন শুর হলো শীলার, জাপানে। কারন, যেখানে সে আটটা পাঁচটা অফিস টাইম মনে করেছিলো, সেখানে তাকে কাজ করতে হয় রাত দশটা, এগারটা পর্যন্ত। ছুটির দিনে ড্রাইভিং স্কুল আর জাপানীজ ভাষা শেখা। আর পুর এক সপ্তাহের রান্না বান্না।

টেলিফোন সমস্যাটা এড়ানোর জন্যে, ইতিমধ্যেই, একটা মোবাইল কিনে নিয়েছে সে। টেলিফোন কিনলেও কারো সাথে তেমন একটা আলাপ হয়ে উঠেনা তার। মাঝে মাঝে তার মামা, এম হকের সাথে সুখ দুঃখের আলাপ করে সে। বেশীর

ভাগ সময়ই তার মামাই তাকে টেলিফোন করে। ঠিক তেমনি এক রাতে মামার টেলিফোনের অপেক্ষাতে ছিলো সে। টেলিফোন এলো মিসেস শামীম থেকে। সে টেলিফোনে বললো, পরবর্তী ছুটির দিনে যেনো অবশ্যই বেড়াতে আসে।

শীলার একার সংসার। কাজের চাপে অনেকটা হাঁপিয়ে উঠেছে সে এখানে। একজন বাংলাদেশী ভদ্রলোকের বাসায়, বেড়াতে গেলে মন্দ হয়না। শামীম সাহেবের বাসায় যাবার জন্যে সময় করে নিলো সে। সেখানে আরো কয়েকটি বাংলাদেশী পরিবার বেড়াতে এলো। দীর্ঘদিন পর, বাংলাদেশীদের সাথে কথা বলে, মজার মজার বাংলা খাবার খেয়ে ভালোই কাটলো তার।

শুধু বেড়াতে গেলেইতো আর হয়না? পাল্টা দাওয়াৎ করতেও হয়। এক ছুটির দিনে, শীলাও দাওয়াৎ করলো সবাইকে, তার বাসায়। শীলা খাবারের আয়োজন করলো অনেক। অথচ, বেড়াতে এলো শুধু শামীম সাহেবের পরিবার, আর মুরাদ সাহেবের পরিবার।

শীলা খাবার পরিবেশন করতেই, মিসেস মুরাদ বললো, আপা, মাংস কিনেছেন কোথা থেকে?

শীলা বললো, কেনো, সুপার থেকে।

মিসেস শামীম জিভ কেটে বললো, বলেন কি? ঐ সব তো হালাল না।

হালাল হারামের ব্যাপারটা বুঝতে পারলো না শীলা। সে ভালো করে দেখে শুনে, গরু আর মুরগীর মাংস কিনেছে। হালাল না হবার কারনটা কি? সে বললো, গরু আর মুরগীই তো?

মুরাদ সাহেব বললো, গরু আর মুরগী হলেই তো আর হলো না। কিভাবে জবাই করা হয়েছে, দেখতে হবে না?

মিসেস মুরাদ বললো, আল্লা, আপনি তাহলে এতদিন, এই মাংস খেয়েছেন?

শীলা বললো, তাহলে, শামীম ভাবীর বাসায় যে, মাংস খেলাম ঐ দিন।

মিসেস শামীম বললো, ঐগুলো তো হালাল শপ থেকে কেনা।

শীলা কথা বাড়ালোনা। বললো, ঠিক আছে, মাংস খাবেন না তো, খাবেন না। সবিজ আছে। সবিজ খান। সবিজর তো আর জীবন থাকে না, তাকে হালালভাবে জবাই করার সমস্যা বোধ হয় নেই।

শামীম সাহেব হঠাৎই তুমি করে ডাকতে লাগলো শীলাকে। বললো, তুমি মনে হয় রাগ করছো। আমি এগ্রি র ছাত্র। সবিজর জীবন থাকবেনা কেনো? জীবন আছে, তবে এই ব্যাপারে ধর্মীয় গ্রন্থে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

সবাই কথা না বাড়িয়ে, সবিজ দিয়ে খাবার খেলো। অথচ, মুরাদ সাহেব তাও খেলোনা। মেহমানরা চলে যাবার পর, শীলার খুব কান্না পেলো। দাওয়াৎ করে কিইনা ভুল করেছে সে।

পরবর্তী ছুটির দিনে শামীম সাহেব নিজ গাড়ীতে করে, কোবে সিটির এক হালাল শপে নিয়ে গেলো শীলাকে। নিজের বাসা থেকে অনেক দূর বলে, বার বার আসা যাবে না ভেবে, অনেক মাংস কিনে নিলো শীলা। বাসায় ফিরে এসে, মাংসের প্যাকেটটা খোলে, মাংস কাটতে যেতেই চোখে পরলো, সাদা জমাট বাঁধা কি যেনো? চর্বি ভেবে কাটতে যেতেই এক ধরনের দুর্গন্ধময় তরল পদার্থ, ছিটকে এসে পরলো, তার চোখে মুখে। রক্ত পোজে পরিণত হয়েছে কি না কে জানে? কারন এসব মাংস আসে হালালভাবে জবাই করা ভিন দেশ থেকে মাস খানেক সময় নিয়ে জাহাজে করে। তার উপর, মুসলিম ক্রেতাদের উপর নির্ভর করে কতদিন যে শপের ফ্রিজে পরে থাকে কে জানে? শীলা সব মাংস আপাততঃ ডাষ্টবিনে ফেললো। মাংসের প্রতি এক ধরনের ঘৃণা জন্মালো তার।

ইদানীং অফিসে ব্যাস্ততা বাড়ছে শীলার। তার ডিজাইন করা ফ্যাশন গুলো, কেউ পছন্দ করছে না। আয়া, তাকে বারবার চাপ দিচ্ছে, এই সামারের মাঝে যদি, মার্কেটগুলো কমপক্ষে, শীলার দশটি ফ্যাশন মূল্যায়ন না করে, তাহলে, বিজনেস গুটাতে হবে তাকে। সানকিয়ো ডিজাইনসের মালিক হবে কিউ এস স্পিন ফাণ্ড। কারন, তাদের সাথে চুক্তি হয়েছে পাঁচ বছরের। এই হলো শেষ বছর। সব টাকা ফেরৎ না দিতে পারলে, আয়া নিজেও একজন কর্মচারী ছাড়া কিছু না।

ঠিক তেমনি একটা মানসিক চাপের সময়, বেড়াতে যাবার জন্যে অনুরোধ করলো, মিসেস ইব্রাহীম। শামীম সাহেবের বাড়ীতেই পরিচয় হয়েছিলো তার সাথে। অনেকটা এক রোখা ধর্মপরায়ন পরিবার মনে হয়েছে তাদের। শীলা সরাসরি নিষেধ করলো, যেতে পারবেনা বলে। অথচ, মহিলা খুব জোড় অনুরোধ করলো। অগত্যা সে গেলো। খালি হাতে বেড়াতে যায় কেমন করে? কেনা কাটার সময় ছিলোনা বলে, সে একটা সাধারন দোকান থেকে, জ্যুসের বোতল কিনে বেড়াতে গেলো।

জ্যুসের আবার জাত আছে নাকি? শীলা যে জ্যুসের বোতলটি নিয়ে গিয়েছিলো, সে টি ছিলো, গ্রেইপ জ্যুস। মিসেস ইব্রাহীম বোতলের লেবেল দেখেই বললো, এতো হারাম, এটা কেনো আনলেন?

শীলা বললো, এতো জ্যুস, হারাম হবে কেনো?

মিসেস ইব্রাহীম বললো, কেনো? আপনি জানেন না, গ্রেইপ থেকে মদ তৈরী হয়।

শীলা কিছুই বুঝতে পারলো না। তার জানা মতে, ভাত থেকে মদ তৈরী করে অনেক দেশে, তাহলে তো ভাতও খাওয়া যাবে না। অনেকে আবার শখ করে পান্তা ভাত খায়। এতো মহা হারাম! সে মুখে কিছু বললো না। শীলার জ্যুসের উপরও রুচি চলে গেলো।

একদিকে কাজের প্রচণ্ড মানসিক চাপ, অন্যদিকে খাবারের হালাল হারামের একটা যন্ত্রনা, এই ভিন দেশে শীলার জীবনটাকে বিষিয়ে তুললো। সে জানে, বাংলাদেশ সহ, অনেক গরীব দেশের মানুষ খেতে পারছেনা, অভাবে। অথচ, শীলার বেতন প্রচুর, তার বেতনের টাকায়, কমসে কম, বাংলাদেশের আঠারোটি পরিবার সচ্ছন্দে খেয়ে পরে বাঁচতে পারবে। অথচ, তার খাবারের রুচি নেই, হালাল হারামের ভয়ে। শীলা মানসিকভাবে খুবই দুর্বল হয়ে পরলো।

ইদানীং, শীলা এক বিশ্রী কাণ্ড করছে। বাসায় যতক্ষন থাকে, ততক্ষণই তার হাতে একটা কাঁচি থাকে। সে সেই কাঁচি দিয়ে নিজের চুল, নিজেই কাটতে থাকে। নাহ, চুল কেটে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্যে নয়। সে চুল কাটে অমনোযোগী ভাবে, মানসিক যন্ত্রনা এড়ানোর জন্যে। এলোমেলোভাবে, চুল কাটাতে, তার মাথার এক বিশ্রী অবস্হা হয়েছে।

সেদিন কাজের মাঝেই, বেহুশ হয়ে পরে গেলো শীলা অফিসে। নিকটস্হ হাসপাতালে নেয়া হলো তাকে। এমন একটি ব্যাস্ততার সময়, শীলার হাসপাতালে ভর্তির ব্যাপারটা, খুবই চিন্তিত করে তুললো আয়াকে। আয়া নিজে হাসপাতালে এসে ডাক্তারকে অনুরোধ করলো, বিশেষ চিকিৎসার জন্যে, তার জন্যে যত টাকাই লাগে, সে দেবে। কারন, সানকিয়ো ডিজাইনসের ব্যাবসা এখন নির্ভর করছে শীলার উপর। এক একটি মিনিটও এখন খুবই মুল্যবান।

ডাক্তার আয়াকে বললো, সাধারন শারীরীক দুর্বলতা। ভয় পাবার কিছুই নেই। আগামীকাল থেকেই কাজে যোগ দিতে পারবে শীলা।

শীলার হুশ ফিরে আসতেই দেখলো, সে এক অজানা জায়গায়। তার হঠাৎই মনে হলো, তাকে আজ, ডিজাইন গুলো নিয়ে ইউকীতে যাবার কথা। সে লাফিয়ে উঠলো। উঠতেই দেখলো, তার হাতে স্যালাইন। শীলার কাঁদতে ইচ্ছে হলো। এই ভিন দেশী স্যালাইনে আবার হারাম কিছু আছে কিনা কে জানে?

ইদানীং দেশে খুব একটা টেলিফোন করা হয়ে উঠেনা শীলার। বিদেশে, শীলা ভালো আছে ভেবে, দেশ থেকেও টেলিফোন তেমন একটা আসেনা। এরই মাঝে, চায়ের আড্ডায় গল্প করার মতো, নুতন একটি বিষয় যুক্ত হলো, এম হকের। সে এখন অন্য সব গল্পের মাঝে, এটিও বলে, আমার একটি নামকরা ডিজাইনার ভাগ্নী আছে। জাপানে থাকে। ঠিক এমনি একটা খোশ গল্পের আসরে তার মোবাইলটা বেজে, সংগে সংগেই কেটে গেলো। ইদানীং মিস কলের সংখ্যা বেড়েছে। এম হক এড়িয়ে গেলো ব্যাপারটা। আড্ডা শেষ হতেই, এম হকের মিস কলের ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুললো। শীলা নয়তো? অনেকদিন মেয়েটার সাথে টেলিফোন করা হয়না। কেমন আছে, কে জানে? এম হক শীলাকে টেলিফোন করলো।

শীলা ঘুমিয়ে পরেছিলো। এত রাতে টেলিফোনের শব্দ, নিশচয় দেশ থেকে। সে ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠে রিসীভ করলো। এম হক জানতে চাইলো, কেমন আছো?

শীলা কি উত্তর দিবে বুঝতে পারছেনা, তারপরও বললো, ভালো।

এম হক বললো, তুমি কিছুক্ষণ আগে টেলিফোন করেছিলে?

শীলা বললো, হুম।

এম হক বললো, কি ব্যাপার? কেটে দিলে যে?

শীলা বললো, না এমনিতেই।

এম হক বললো, এমনিতেই হলে, আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে সমস্যা থাকলে অবশ্যই আমাকে জানাবে।

শীলা টেলিফোনে কেঁদে ফেললো। বললো, মামা তোমাদের শীলা ভালো নেই। কিন্তু, মা বাবাকে কক্ষনো বলবেনা।

এম হক কিছুই বুঝলোনা। সে বললো, শীলা, কি ব্যাপার খোলে বলো। জাপান ভালো না লাগলে, চলে এসো দেশে।

শীলা কান্না থামালো। বললো, না মামা, আমি আমার টার্গেটে না পৌঁছে, দেশে ফিরে যাবোনা। তুমি দেখবে, পরাজিত কোন শীলা বাংলাদেশে ফিরে যাবেনা।

শীলা লাইন কেটে দিলো।

সেদিন অফিসে যেতেই, শীলা দেখলো, আয়াকে খুব অন্য রকম দেখাচ্ছে। তাকে খুব খুশী খুশী লাগছে। শীলা অফিস কক্ষে ঢুকতেই, আয়া বললো, দাইসেই থেকে, দশ দিনের শো প্লেসের একটা অনুমতি পেয়ে গেছি। সব তোমার জন্যে। তোমার সবগুলো ডিজাইন তারা পছন্দ করেছে। তবে হাতে সময় খুব কম। আগামী শুক্রবারের মধ্যেই মাস প্রোডাকট ডেলীভারী দিতে হবে। আমি ইতিমধ্যে ফ্যাকটরীতে অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। কাল সন্ধ্যায় অর্ডারের সব পোষাক চলে আসবে। তিন দিনের বেশী সময় নাই। এই তিনদিনে, দেড় হাজার পোষাকের কোয়ালিটী চেক করে, নিঁখুত এক হাজার পোষাক সাপ্লাই দিতে হবে, দাইসেই এর তিনটি শাখায়। ভাবছি, ওসাকাতে পাঠাবো হিতোমীকে, তোমাকে পাঠাবো নাগানোতে, আর আমি হিরোশিমাতে। কি বলো?

দীর্ঘদিন, শীলার মনে কোন আনন্দ ছিলোনা। আয়ার কথা শুনে তার চিত্ত প্রফুল্লিত হয়ে উঠলো। নাগানো কেনো? তাকে যদি নির্দেশ দেয়া হয়, সাত সাগর আর তেরো নদী সাতরিয়ে, অজানা কোন এক দেশে গিয়ে, তোমার কৃতকর্মের একটা প্রচার করে এসো, তাতেও সে রাজী।

বড় বড় কোম্পানীগুলোতে কোয়ালীটি কন্ট্রোল বিভাগ বলতে, একটি আলাদা বিভাগ থাকে। ছোট ফার্মগুলোতে এসব থাকেনা। শীলা যেমনি, একাধারে ডিজাইনার, তেমনি নিজের ডিজাইনের মার্কেটিং রিপ্রেজেন্টেটিভও সে। তেমনি তার প্রোডাকটের কোয়ালিটী চেকও নিজেকেই করতে হবে। তবে সমস্যা হলো, মাত্র তিন দিনে, দেড় হাজার পোষাকের একটি একটি করে খুঁত আছে কিনা খোঁজে বেড় করা। দেড় হাজার পোষাকের ভেতর থেকে, ডেলীভারী দিতে হবে নিঁখুত এক হাজার পোষাকের। যদি নিখুঁত পোষাক একটিও কম হয়, তাহলে আবার রিপ্রোডাকশন।

শীলা খাবার, ঘুম সবই ভুলে গিয়ে, একটি একটি করে পোষাকের খুঁত খোঁজতে লাগলো।

শুক্রবার বিকাল তিনটা, তখনো একশোয়ের উপর বাকী, ডেলীভারীর এক হাজার পুরু হতে। ট্রাক অপেক্ষা করছে, মালামাল নেয়ার জন্যে। রাতারাতি আবার দাইসেইয়ের শো প্লেসে গিয়ে, সাজাতে হবে সেগুলো নিজেদের গিয়ে। আয়া বার বার ঘড়ি দেখছে, আর বলছে, আর কতক্ষণ?

শীলা ঘড়ি দেখে, হিসাব করে বললো, কমসে কম আরো তিন ঘন্টা।

হিতোমী অন্য কাজ করছিলো। আয়া নির্দেশ দিলো তাকে, শীলাকে সাহায্য করার জন্যে। কারন, পাঁচটার পর ট্রাক আর অপেক্ষা করবেনা।

পাঁচটা বেজে গেছে। নিঁখুত পোষাক একহাজার পূর্ণ হয়নি তখনো। আয়া বললো, যা হয়েছে তাতেই আগে, ট্রাক বিদায় করো। অসম্পূর্নগুলো, ওসাকাতে হ্যাণ্ড ক্যারী করে নিয়ে যাবে হিতোমী। আর শীলা, তুমি জলদি বেড়িয়ে পরো নাগানো যাবার জন্যে। আমিও বেড়োচ্ছি হিরোশিমার উদ্দেশ্যে।

শীলা রওনা হলো নাগানোর উদ্দেশ্যে। তিনদিনের একটানা পরিশ্রম, অনেকটা অপরিমেয় ঘুম আর ক্ষুধায় তার শরীর অবসন্ন হয়ে আছে। ঘন্টা খানেক ড্রাইভ করতেই প্রচণ্ড ক্ষুধা পেলো শীলার। কোন এক কবি বলেছিলো, ক্ষুধার রাজ্যে পৃথীবী গদ্যময়, কথাটা মিথ্যে নয়। শীলার ড্রাইভ করতে ভালো লাগছে না আর। সে পথিমধ্যে একটা রেষ্টুরেন্টে গাড়ী থামালো। রেষ্টুরেন্টে ঢুকে সে দেখলো, দিনের শেষে ক্লান্ত সব জাপানীজরা খেতে বসেছে, বিয়ারে চুমুক দিয়ে। শীলা একটি খালি টেবিলে গিয়ে বসে প্রথমেই অর্ডার দিলো, লাইফ বিয়ার এক গ্লাস।

শীলা বিয়ারে চুমুক দিয়ে, খাবারের মেন্যু দেখতে লাগলো। তারপর বেল টিপে অর্ডার দিলো, পুড়া গরুর মাংস, আর র ফিস।

শীলা, পুড়া গরুর মাংস, আর র ফিস খেতে খেতে আরো দু গ্লাস লাইফ বিয়ার পান করলো। পেটে বিয়ার আর খাবার পরায়, দেহে প্রচণ্ড এক শক্তি, আর মনে প্রচণ্ড এক সাহস ফিরে পেলো শীলা। কেমন যেনো, নুতন এক জীবনের সন্ধান পেলো সে।

শীলা নুতন উদ্যমে ড্রাইভ শুরু করলো।

নাগানোর পথে আধিকাংশই পাহাড়ী পথ। দুর্বার বেগে ছুটছে শীলার গাড়ী, নাগানোর পাহাড়ী পথে। অনেকটা দূর এগিয়ে যেতেই, পথিমধ্যে রাস্তা মেরামতের কাজের একটা নোটিশ চোখে পরলো, তার। যাতায়াতের উভয় দিকের জন্যে, একটি মাত্র পথ নির্ধারিত। ঝোপের আড়ালে, সিগনালটা চোখে পরলোনা শীলার। এত রাতে, অপর পাশ থেকে গাড়ীও আসছেনা দেখে, শীলার গাড়ী এগিয়ে চললো। কিছু দূর এগুতেই শীলার চোখে পরলো, বেশ গতি নিয়ে এগিয়ে আসছে একটি গাড়ী, বিপরীত দিক থেকে। শীলা চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগলো। বিপরীত দিকের গাড়ীটি অনেক চেষ্টায় গতি কমিয়ে এনেছে। শীলা তার গাড়ীর গতি কমাতে পারছেনা। শীলা ষ্টীয়ারীং ঘুড়িয়ে বিপরীত দিকের গাড়ীটির সাথে, সংঘর্ষ এড়ানোর চেষ্টা করলো। শীলার গাড়ী ধাক্কা খেলো রাস্তার পার্শ্ববর্তী রেলিংয়ে। রেলিংয়ে ধাক্কা খেয়ে, তার গাড়ীটি শূন্যে খানিকটা লফিয়ে উঠে, পরলো পাহাড়ী ঢালে।

বিপরীত দিকের গাড়ীর চালক, পুলিশ, রেস্কিউ টীম, এম্বুল্যান্সে খবর দিলো। রেস্কিউ টীম এলো সবার আগে। অথচ, পুলিশের অনুমতি ছাড়া, রেস্কিউর কাজে, হাত দেবার অনুমতি নেই। পুলিশ এলো, এম্বুল্যান্স এলো। শীলাকে হাসপাতালে নেয়া হলো। শীলা মারা গেলো।

হাসপাতাল থেকে পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট দেয়া হলো। পুলিশ তাদের নিজেদের মতো, বিচার বিশ্লেষন করে, তদন্ত রিপোর্ট পেশ করলো। মদ্য পান জনিত গাড়ী চালনা, সিগনাল আমান্য। তবে, সীট বেল্ট বাঁধা থাকলে হয়তো প্রাণে বাঁচানো যেতো। যারা ধর্ম নিয়ে বেশী ভাবেন, তাদের কাছে, শীলার মৃত্যুর ব্যাপারটি খুবই সহজ। কারন, তারা এক বাক্যে বলে ফেলবেন, এ যে, মদ্যপাপ, অপমৃত্যু হবেনা কেনো?

আমি একটি জনপ্রিয় গানের কথা জানি, যে গানের কথাগুলো এই রকম। নয়ন সবার নয়ন মণি, কানাডায় গিয়েছিলো, করতে সে গান, সেই যে গেলো, ফিরে এলো না। সেই নয়ন হয়তো, মদ্য পান করেনি, অথবা, হারাম কোন কিছুর ছোয়া তার গায়ে লাগেনি, তাই তাকে নিয়ে গান হয়েছে। আমার গল্পের শীলাতো মদ্যপাপী। তাকে নিয়ে তো আর কেউ, গান রচনা করার কথা না। কবিতা লিখার কথা না।

এম হক, চায়ের আড্ডায়, ইদানীং খুব একটা জমাতে পারেনা। চায়ের আড্ডাতে, সবাই অনেক রকমের গপ করে। এম হক চুপচাপ শুনে সব। সবার গপ শেষ হয়ে গেলে, এম হক বিড় বিড় করে বলে, আমার একটি ভাগ্নী ছিলো। এতদিনে হয়তো, অনেক নামকড়া ডিজাইনার হতে পারতো!

অনেকেই প্রশ্ন করে, হয়নি কেনো?

এম হক বড় এটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, হবার জন্যেই তো বিদেশ পাড়ি দিয়েছিলো, কই, আর তো ফিরে এলো না।

অনেকেই মজা করে বলে, বিদেশী কাউকে বিয়ে করে ফেলেছে বুঝি?

এম হক আড্ডা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বিড় বিড় করে বলে, কাউকে বিয়ে করে, ভিন দেশে থেকে গেলেও তো ভালোই হতো। তারপরও বলতে পারতাম, একজন নামকড়া ডিজাইনার এখনো বেঁচে আছে।

এম হক নিজের মাথার চুল নিজেই টানতে টানতে, আকাশের তারাদের দিকে তাঁকিয়ে থাকে। সে খোঁজতে থাকে, ওই তারাদের মাঝেই, একটি হয়তো তার অতি আদরের শীলা মণি।

(শীলা আর এম হক সহ প্রাসংগিক চরিত্র গুলো সম্পূর্ন কাল্পনিক। এই গল্পের স্হান, কাল, আর পাত্রপাত্রীদের কারনে, কেউ যদি নিজের সাথে মিল পেয়েই যান, তাহলে ক্ষমা করবেন।)

শীলা উপন্যাস থেকে সংকলিত